

## সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ ঃ নাস্তিক ঠেকাতে গিয়ে আন্তিকরাই এখন বিধ্বস্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাদের কাছে আপদ হিসেবে দেখা দিলো সোভিয়েত শক্তির উত্থান। সোভিয়েত রাশিয়া তো বটেই আরো কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এদিকে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীনে লাল পতাকার জয় হলো। কোরিয়া বিভক্ত হয়ে উত্তরটা কম্যুনিষ্ট এবং দক্ষিণটা তথাকথিত মুক্ত বিশ্বের সদস্য হলো। ভিয়েতনামেরও একই অবস্থা। উত্তরটা কম্যুনিষ্ট এবং দক্ষিণে মার্কিন তাঁবেদার সরকার। তবে কোরিয়াতে দুটো দেশই নিজ নিজ এলাকার নিজ নিজ আদর্শ নিয়ে থাকলো। কিন্তু ভিয়েতনামে তেমনটি হলো না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের তৎপরতা চলতে লাগলো। বলাবাহুল্য উত্তর ভিয়েতনামের সাহায্য আসতে লাগলো, যার পেছনে দৃঢ়ভাবে সমর্থন দিলো সোভিয়েত রাশিয়া। এর প্রতিবেশী লাওস এবং কম্বোডিয়াতে কম্যুনিষ্ট তৎপরতা বাড়তে লাগলো। এই পুরো অঞ্চলটা ইন্দোচায়না বলে পরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। যুদ্ধের পর পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে গেছে। যেমন কম্বোডিয়ার রাজা পূর্ণ স্বাধীনতা চাইলেন। ফরাসিরা আর একবার তাদের হুতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করলো। কিন্তু হো চি মিনের বাহিনীর কাছে ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফিউতে যেভাবে পর্যুদস্ত এবং বিধ্বস্ত হলো, তাতে তাদের এ অঞ্চল থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিল না। তবে এ অঞ্চলে কথিত মুক্তবিশ্বের এক নম্বর শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবির্ভূত হলো। পঞ্চাশের দশকের প্রথমের ঘটনা এসব। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সাবেক সমরনায়ক মি. আইসেন হাওয়ার। গত ৬ জুন ফরাসি উপকূল নরম্যান্ডিতে ঘটা করে ৬০তম ডি-ডে পালিত হলো। হিটলারকে উৎখাতের জন্য মিত্রবাহিনী বেশ ক্ষতি স্বীকার করে নরম্যান্ডি উপকূলে অবতরণ করে। এটি নিঃসন্দেহে যুদ্ধের একটি টার্নিং পয়েন্ট। জেনারেল আইসেন হাওয়ার মিত্রবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাধ্যক্ষ। নরম্যান্ডি অবতরণের সাফল্য তাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে। এই জনপ্রিয়তার কারণেই তিনি পর পর দুবার ('৫২ এবং '৫৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এর আগে আর একজন সমরনায়ক ক্যান্টনমেন্ট থেকে হোয়াইট হাউসে যান। তিনি হলেন ইউলিসেস এমগ্রান্ট। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর মি. গ্রান্ট ১৮তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন (১৮৬৮ ও '৭২)।

ইন্দোচীনের এ অবস্থাকে মি. আইসেন হাওয়ার ডোমিনো ইফেক্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ডোমিনো একধরনের খেলা যেখানে একটি গুটি পড়লে তার ফলে বাকি সব গুটি

পড়তে থাকে। তো একটি দেশ কম্যুনিষ্ট দেশ হলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর অবস্থাও অনুরূপ হবে। তাই একে ঠেকাতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ডোমিনো থিওরিকে সুরণ রেখে আইসেন হাওয়ারের পর কেনেডি এবং জনসন তাদের নীতি নির্ধারণ করেন।

তবে কম্যুনিষ্ট ঠেকাতে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিভিন্ন সামরিক জোট গঠন শুরু হয়। সবচেয়ে বড়ো জোট ন্যাটো (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন)। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে এই জোট। তারপর বাগদাদ প্যাক্ট। পরে ১৯৫৮ সালে ইরাকে রাজতন্ত্র উৎখাত হলে সে দেশ বেরিয়ে যায়। নাম পাল্টিয়ে রাখা হয় সেন্টো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য সিয়াটো চুক্তি (সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন)। এছাড়া ছিল আনজুস (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইউএস)। এসবের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উদ্দেশ্য বাম কম্যুনিষ্ট বিস্তৃতি ঠেকানো। পাকিস্তান সিয়াটো এবং সেন্টোর সদস্য ছিল। পাকিস্তানের কি প্রয়োজন ছিল তা বুঝতে পারছি না। তবে এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে হলো। এক লোক ছাগল হারিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজছে। খালের ধারে ঝোপঝাড়ে বাড়ি দিচ্ছে যেন ছাগল বেরিয়ে পড়ে। এই আওয়াজ শুনে বড়ো এক কোলাব্যাঙ পানিতে লাফিয়ে পড়ে। শব্দ শুনে ঐ ব্যক্তি সাগ্রহে তাকিয়ে দেখতে যায়। ব্যাঙ দেখে বলে, 'আমি খুঁজছি ছাগল, তুই ক্যান লাফ দিস।' ইঙ্গোমার্কিন নেতারা ভেবেছিলেন যে, হিটলারকে পরাজিত করার পর তারাই হবেন বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। কিন্তু অন্তরায় হয়ে গেলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। মিত্রশক্তির অন্যতম শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হলো। যার ফলে পাশ্চাত্য শক্তি তার ইচ্ছামতো জাতিসংঘকে ব্যবহার করতে পারছে না। এর সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ না করলে আমরা এক দীর্ঘমেয়াদি মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পরতাম। অনেক পথ হাঁটতে হতো, আরো অনেক রক্ত দিতে হতো। শুধু আমরা কেন, আরো বহু, বিশেষ করে আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়।

কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে আর একটি বড়ো অপপ্রচার হলো এরা নাস্তিক। ধর্মে বিশ্বাস করে না, সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে না। প্রচারটা এমনভাবে চালানো হয় যে, যেকোনো ব্যক্তি কম্যুনিষ্ট মতবাদে দীক্ষা গ্রহণের আগে নিজেকে নাস্তিক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, অক্টোবর বিপ্লবের সময় বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে। রাশিয়ায় বিপ্লবের সময় ধর্মালঙ্কার গোত্রের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করতে হয়েছে। এরা ধর্মীয় স্থানগুলোয় অস্ত্রশস্ত্র রেখে তা সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। ফলে যা হওয়ার তা হয়েছে। যেকোনো মতবাদ বা আদর্শ প্রথমে যেভাবে উপস্থাপিত হয়, পরবর্তী সময়ে আর সেরকম থাকে না। সময়ের তালে অনেক পরিবর্তন আসে।

সোভিয়েত বিপ্লবের সময় যা হোক না কেন, পরে অনেক বেশি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা দেখানো হয়েছে। কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক তথা কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠায় ধর্ম কোনো ইস্যু নয়। গত ২৭ বছর ধরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় রয়েছে। কোনো মন্দির/মসজিদ কি ভাঙা হয়েছে। বরঞ্চ উগ্র ধর্মানুসারীরা নিজেদের ধর্মপ্রতিষ্ঠান রেখে অন্যেরটি ভাঙতে চায়। যেমন মৌলবাদী বিজেপি সুযোগ পেলেই মসজিদ ভেঙে মন্দির বানাতে চায়। আর কম্যুনিষ্টরা কারোরটি নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাকিস্তানের জনক জিন্নাহ সাহেব জাতির উদ্দেশে ঈদ বাণী দিতে গিয়ে একটি সুরগীয়া মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জপলমবমসষ মঢ় য়ভপ হপড়ঢ়সমথল ফথময়ভ সফ পথধভ মষনমংমনংথল' (ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে 'আমরা খোদায় বিশ্বাস রাখি' লেখা সত্বেও সে দেশে বহু নাস্তিক বা সংশয়বাদী রয়েছে। আরো শুনেছি যে, এই নাস্তিক আর সংশয়বাদীরা ডেমোক্র্যাট দলের সমর্থক, আর গোঁড়া খ্রিস্টানরা রিপাবলিকান দলের। ইউরোপে একটি জরিপে দেখা গেছে যে, সুইডেনে তুলনামূলকভাবে নাস্তিকের সংখ্যা বেশি। সম্মানিত পাঠক, এই সাতকাহনের উদ্দেশ্য এই যে, রাষ্ট্র ধর্ম সম্বন্ধে যা বলুক না কেন, ব্যক্তির কাছে ধর্ম মানা না মানা তার নিজস্ব ব্যাপার।

ইসরায়েলের বড়ো মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্যালেস্টাইনিদের ওপর কি পরিমাণ নিপীড়ন, নির্যাতন চলছে তা বলার প্রয়োজন নেই। তারপরও সোভিয়েত-মার্কিনিদের স্নায়ু যুদ্ধ চলাকালে আরব বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশিমাাত্রায় গ্রহণযোগ্য ছিল এ জন্য যে, তারা নাস্তিক নয়। আবার ইরানে ইসলামি বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় এলে তৎকালীন সাদ্দামের ইরাক মার্কিনের সাহায্যপুষ্ট হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে ১০ বছর যুদ্ধ করলো। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সোভিয়েত বিরোধী শক্তি গঠন এবং তাকে সবরকমের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর আফগান ভাইদের এই নাস্তিকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং আরো কিছু মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানে একটি সরকার ছিল, কতোটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। সে প্রশ্ন এখনো অনেক দেশের সরকার সম্বন্ধে বলা যায়। সেই সরকারের অনুমতি নিয়ে সোভিয়েত সৈন্য ঢোকে। হতে পারে সেই অনুমতিও জোরপূর্বক। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সোভিয়েত সৈন্যরা একশভাগ দখল করার বাহিনী ছিল না। পাকিস্তান আফগানিস্তানের প্রতিবেশী। তার সাহায্য করার সুযোগ বেশি। শেষপর্যন্ত একটি চরম গোঁড়া ও উগ্র ধর্মীয় দল তালেবানরা ক্ষমতা দখল করে। কি রকম নিষ্ঠুর এরা তার প্রমাণাদি তো এদের পতনের পর পাওয়া গেছে। শুধু পতন কেন, এদের শুরুরতেও সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, যখন তারা ড. নজিবুল্লাহ ও তার সঙ্গীদের হত্যা করে। কিন্তু সে সময় পশ্চিমারা একে আমলে আনেনি। আনলো যখন টুইন টাওয়ার খেলনার মতো ভেঙে পড়লো এবং পৃথিবীর

সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীকে নিরাপদ মনে করতে না পেরে আকাশে বিচরণ করলেন।

গত এক যুগের বেশি সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়েছে। কদিন আগে ৪০তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি মি. রিগ্যান মারা গেলেন। তিনি '৮১ থেকে '৮৯ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। সে সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিসেস থ্যাচার। এরা দুজনেই কটর সোভিয়েতবিরোধী ছিলেন। মি. রিগ্যান রাশিয়াকে শয়তানের বাড়ি বা এ রকম একটা কিছু বলেছিলেন। বর্তমান সংখ্যার সাপ্তাহিক ইকনোমিস্টে কভার পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'এওভপ শথষ াভস দপথয় ধসশশৎষমঢ়শ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কম্যুনিজমকে পরাস্ত করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা ইউরোপীয় কম্যুনিষ্টদের কীভাবে পতন হলো, কার কতো অবদান তা অনেক বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়। তবে রিগ্যান সাহেব মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, ধনীর উদ্ভূত সম্পদ চুইয়ে চুইয়ে গরিবের কাছে আসবে। তা আসেনি। বিশ্বে দারিদ্র্য আরো বেড়েছে। এদিকে বিশ্বেইবা কতোখানি হানাহানি কমেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একক শক্তিশালী রাষ্ট্র। সোভিয়েত তাঁবেদার তো কেউ নেই। তাই এখন সবার প্রতি তার সমান দৃষ্টি থাকার কথা। কিন্তু কই, এখনো তো ইসরায়েলের প্রতি চরম পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে চলছে। ইসরায়েল খুঁজে খুঁজে টার্গেট করে প্যালেস্টাইনিদের হত্যা করছে, মার্কিন মানবাধিকার কর্তারা একে দেখছেন। ইরাকে আদর্শ গণতন্ত্রের বীজ বপন করা হবে। সে জন্য মার্কিনীদের আগমন। অথচ সে দেশের বন্দীদের ওপর যে বিকৃত রুচির নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার ছবি আমার মতো একজন অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি একবার দেখে দ্বিতীয়বার তাকাতে পারিনি। ইরাকিরা আর কিসের স্বপ্ন দেখবে? দীর্ঘ সময় ধরে মৌলবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার সুফল পাকিস্তান পেতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির জীবননাশের চেষ্টা করা হয়েছে। দুদিন আগে করাচিতে এক জেনারেলকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। আহমদিয়াদের কথা ভিন্ন। কিন্তু শিয়া-সুন্নিতে যেটুকু পার্থক্য, তাতে একে অপরকে খুন করার মতো অবস্থা হওয়ার কথা নয়। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা আজ কোন পর্যায়ে গেছে, অবলীলাক্রমে শিয়া-সুন্নিতে হত্যা-পাল্টা হত্যা চলছে। এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বোধহয় এখন আর কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

সৌদি আরব একটি কঠোর এবং সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার দেশ বলেই জানতাম। কিন্তু গত দুবছর ধরে চিত্রটা পাল্টাতে শুরু করেছে। এ দেশেই মুসলমানদের পবিত্রতম দুটি শহর মক্কা শরিফ এবং মদিনা শরিফ অবস্থিত। সঙ্গত কারণে এ দেশে অনাবিল শান্তি থাকুক, আমরা তা চাই। ২০০৩ সালে ১০টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। এ বছর ইতিমধ্যে ১১টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। গত ১৩ মাসে এসব সন্ত্রাসী ঘটনায় ৮৫ জন বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। এর বেশিরভাগই বিদেশী নাগরিক। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত সরব

হয়েছে সৌদি আরবে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিয়ে। তাদের বক্তব্য, সৌদি রাজপরিবারকে এ লড়াইয়ে জয়ী হতেই হবে। এর জন্য সংস্কারের প্রয়োজন রাজনৈতিক, সামাজিক উভয় প্রকারের। টেকসই গণতন্ত্র দিতে হবে।

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম বলছে যে, এ লড়াইয়ে সৌদি রাজপরিবারকে জিততেই হবে। আমরাও চাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সৌদি শাসকরা জয়লাভ করুন। এখন পর্যন্ত দুনিয়ার আবিষ্কৃত তেলের যে মজুদ রয়েছে তার এক-চতুর্থাংশ সৌদি আরবে। তাই আমাদের আশঙ্কা যে, এ সন্ত্রাস দমনের জন্য পাশ্চাত্যরা এমন কোনো ব্যবস্থাপত্র না দিয়ে বসে যার ফলে সমস্যা আরো প্রকট হয়। যেমনটি দেখছি ইরাকে। হাজার হাজার নিরীহ ইরাকি (নারী ও শিশুসহ) গণতন্ত্রের বেদিতে প্রাণ দিচ্ছে।  
সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ : সাবেক ইপিসিএস ও কলাম লেখক।

Source: Daily Bhorer Kagoj

Collection: Khairul Habib, NUS, Singapore

[www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com)